বাংলাদেশের ভূমি বিন্যাস রীতি ও কৃষি উৎপাদনের ধরণঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

(Patterns of Land Distribution System and Agricultural Production in Bangladesh: A Historical Overview)

বিজয় কৃষ্ণ বণিক*

Abstract: The paper attempts to show the relationship between land distribution system and agricultural production trends in Bangladesh context. The main objective of the paper is to explain how various land distribution systems at different times have influenced agricultural production in Bangladesh. The study is a qualitative study mainly based on historical research method in which a variety of secondary sources have been examined including books, articles and different reports. The study has found that while systematic land distribution system was initiated in Bangladesh during the Muslim period, it continues to prevail to date. It draws a conclusion that land distribution system in different phases seem to have failed in reducing the number of landless people, rather it helps in consolidating lands in few hands. Unless a pro-poor land distribution system is implemented, the gap between landless people and landlords in all respects cannot be bridged up.

Keywords: land distribution system, agrarian structure of Bangladesh, class formation

ভূমিকা

এশীয় সমাজের নিশ্চলতার জন্য মার্কস প্রধানত ভৌগোলিক অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যকে দায়ী করেছেন। বিশেষ করে সাহারা থেকে শুরু করে আরব, পারস্য, ভারতবর্ষ, তাতার এবং এশীয় উচ্চ অঞ্চল পর্যন্ত এলাকায় কৃষির ভিত্তি ছিলো খাল-খনন করে কৃত্রিম জলসেচ ব্যবস্থা। মিশর, ভারতবর্ষ, মেসোপটেমিয়া এবং পারস্য দেশে জল প্লাবনকে জমি সুফলা করে তোলার জন্য ব্যবহার করা হতো। আবার, পাবর্ত্য এলাকার উচ্চতাকে সেচের খালে জল প্রবাহিত করার কাজে ব্যবহার করা হতো। জলের এই বিচক্ষণ এবং সাধারণ ব্যবহারের মৌল প্রয়োজনে, প্রাচ্যের নিম্নস্তরের সভ্যতায় এবং সুবিস্তীর্ণ এলাকায় সরকারের কেন্দ্রীভূত শক্তির হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে সমস্ত এশীয় সমাজের উপর লোকহিতকর কর্মকাণ্ডের অর্থনৈতিক দায়িত্ব এসে পড়ে। মার্কসের মতে, এশীয় সমাজে উৎপাদন সংগঠনের জন্য ব্যাপক জলসেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা দেখা দেয়। ভূ-প্রকৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে এশিয়ার সমাজ ব্যবস্থায় (যেখানে কৃষি উৎপাদনের পূর্বশর্ত হচ্ছে জলসেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে। এর অর্থ হচ্ছে, তখন ভূমিতে কোন ধরনের ব্যক্তিগত মালিকানা বিকাশের সুযোগ ছিলো না (Marx and Engels, 1968)। যেহেতু এখানে কৃত্রিম জলসেচ (artificial irrigation) করা হতো, সেহেতু এর দায়িত্ব ও তত্ত্বাবধান কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকতো। আর এ কারণে মার্কস সে সময় এশীয় সমাজে প্রচলিত

* Professor, Department of Sociology, University of Rajshahi, Rajshahi 6205
Email: bkbanik2001@yahoo.com

অর্থনীতিকে জলভিত্তিক অর্থনীতি (hydraulic economy) এবং এখানে প্রচলিত কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে স্বৈরাচারী (Despotic) শাসনব্যবস্থা হিসেবে অভিহিত করেছেন (Wittfogel, 1957)।

পরবর্তীতে বৃটিশরা ক্ষমতায় আসার পূর্ব পর্যন্ত ভূমিতে কেন্দ্রীয় সরকারের একক মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ বলবৎ ছিলো। বৃটিশরা ক্ষমতায় আসর পর জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রচলনের প্রয়াস পায়। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রদান শুরু হয় (Hashmi, 1994)। স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীনতা-উত্তর বিভিন্ন সময় জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানায় বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তন আনা হয়। এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন শাসনামলের ভূমি ব্যবস্থার সাথে কৃষি উৎপাদনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা। এই নিমিত্তে এখানে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময়কালকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই ভাগগুলো হলো হিন্দু শাসনামল (১২০৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত), মুসলিম শাসনামল (১২০৪-১৭৫৭), বৃটিশ শাসনামল (১৭৫৭-১৯৪৭), পাকিস্তান শাসনামল (১৯৪৭-১৯৭১) এবং স্বাধীনতা উত্তরকাল (১৯৭১ থেকে শুরু)। এখানে ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি (Historical Research Method) অনুসরণ করা হয়েছে এবং মাধ্যমিক উৎস (Secondary Sources) থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সহায়ক তথ্যের জন্য ভূমি ব্যবস্থার সাথে কৃষি উৎপাদনের সম্পর্ক নির্দেশক পুস্তক, পুস্তিকা, প্রবন্ধ, রিপোর্ট ও সাময়িকীর সাহায্য নেয়া হয়েছে। এই প্রবন্ধে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি-বিন্যাস রীতি এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত কৃষি উৎপাদনের প্রচলিত ধরণ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিভাবে বিভিন্ন সময়ের ভূমি বণ্টনব্যবস্থা কৃষি উৎপাদনকে প্রভাবিত করেছে তাও এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণের প্রয়াস পাওয়া গেছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে প্রাপ্ত ভূমি ব্যবস্থাপনা ও কৃষি উৎপাদনের ধরণ

হিন্দু শাসনামল

প্রাচীন বাংলায় হিন্দু শাসনামলের প্রথমদিকে (খ্রিস্টোত্তর পঞ্চম থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত) প্রাপ্ত দলিল-দস্তাবেজ থেকে দেখা যায় যে, তৎকালীন সময়ে আজকের মত ভূমি ক্রয়-বিক্রয় ছিলো না। কিন্তু প্রথমদিকে (খ্রিস্টোত্তর পঞ্চম থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত) ভূমিদান বিক্রয় এবং দ্বিতীয় দিকে (অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত) ভূমিদানের ব্যবস্থা দেখতে পাই। প্রাচীন বাঙলায় ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কিত এ পর্যন্ত যে সব পট্টোলী বা তাম্রশাসন বা লিপিমালা পাওয়া গিয়েছে, সেগুলিকে খ্রিস্টোত্তর পঞ্চম থেকে অষ্টম শতক এবং খ্রিস্টোত্তর অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতক এই দুইটি পর্যায়ে ভাগে ভাগ করা যায়। খ্রিস্টোত্তর পঞ্চম থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত লিপিগুলি সমস্ত ভূমিদান-বিক্রয় সম্বন্ধীয়; এই লিপিগুলিতে ভূমিদান বিক্রয় রীতিক্রমও কমবেশি বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হয়েছে। ভূমি সম্পর্কিত দায় ও অধিকার, ভূমির প্রকারভেদ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য এই লিপিগুলোতে পাওয়া যায়। রাজা কর্তৃক ব্রাহ্মণকে কিংবা দেবতার উদ্দেশ্যে ভূমিদানের লিপি বা দলিল প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত নয়; কিন্তু প্রাচীন বাংলায় এই পর্বের লিপিগুলি ঠিক এই জাতীয় ব্রহ্মদেয় বা দেবোত্তর ভূমিদানের পট্ট বা দলিল নয়। এই লিপিগুলি একটু বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করলে প্রাচীন বাংলার ভূমিব্যবস্থা সম্বন্ধে এমন সব তথ্য পাওয়া যায় যা সাধারণত প্রাচীন ভারতের ভূমিদান সম্পর্কিত লিপিগুলিতে বেশি দেখা যায় না। ঐ সময়ে জমি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ছয়টি ধাপ অতিক্রম করতে হতো। এই ধাপগুলো হলো (রায়, ১৪০২; মিশ্র ও আখতার):

প্রথমত, ভূমি-ক্রয়েচ্ছু যিনি তিনি স্থানীয় রাজসরকারের কাছে আবেদন বিজ্ঞাপিত করতেন। ক্রয়েচ্ছু একজনও হতে

পারতেন, একজনের বেশিও হতে পারতেন এবং একাধিক ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি একই সঙ্গে ক্রয়ের ইচ্ছা বিজ্ঞাপিত করতে পারতেন।

দ্বিতীয়ত, ভূমি ক্রয়ের বিশেষ উদ্দেশ্যটি কি, তা আবেদনকারী সাধারণত প্রথম পুরুষেই বিজ্ঞাপিত করতেন, এবং তিনি যে ক্ষেত্র (চাষের আওতাধীন ভূমি), খিল (অকর্ষিত ভূমি) অথবা বাস্তুভূমির (বসবাসের ভূমি অর্থাৎ বাস্তুভিটা) স্থানীয় প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মূল্য দিতে প্রস্তুত আছেন, তাও ঘোষণা করতেন। সর্বত্রই ভূমি ক্রয়ের প্রেরণা ক্রীত-ভূমি দেবকার্য বা ধর্মাচরণ উদ্দেশে দানের ইচ্ছা প্রতিফলিত হতো।

তৃতীয়ত, ভূমি ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তির আবেদন রাজসরকারে পৌঁছালেই রাজসরকার তা পুস্তপাল বা পুস্তপালদের (দলিল সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত রাজকর্মচারী) দপ্তরে পাঠাতেন; পুস্তপাল প্রস্তাবিত ভূমি আর কারও ভোগ-দখলে আছে কিনা, অন্য কেউ সেই ভূমি ক্রয়ের ইচ্ছা জানিয়েছে কিনা, ভূমির মূল্য যথাযথ নির্ধারিত হয়েছে কিনা, রাজসরকারের কোনও স্বার্থ আছে কিনা ইত্যাদি জ্ঞাতব্য তথ্য নির্ণয় করে তার দপ্তরে রক্ষিত কাগজপত্র, শাসন ইত্যাদির সাহায্যে এবং কোনও প্রকার আপত্তি না থাকলে প্রস্তাবিত ভূমি বিক্রয়ের সম্মতি জানাতেন।

চতুর্থত, যথানির্ধারিত মূল্য গ্রহণের পর রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে স্থানীয় রাজসরকার ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের ভূমি বিক্রয়ের অনুমতি দিতেন, এবং প্রস্তাবিত ভূমি যে গ্রামে অবস্থিত, সেই গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও ব্রাহ্মণ-কুটুম্বদের ও রাজপুরুষদের সম্মুখে বিক্রীত ভূমির সীমা নির্দেশ করে, অন্য ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে, স্থানীয় প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ভূমির মাপজোখ করে বিক্রীত ভূমি ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে হস্তান্তর করতেন।

পঞ্চমত, এই পর্বে ক্রেতা অথবা বিক্রেতা কাকে বা কাদের কি উদ্দেশ্য, কোন কোন শর্তে ক্রীত ভূমিদান করছেন তাও ঘোষিত হতো। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ক্রেতার পক্ষ থেকে বিক্রেতাও তা ঘোষণা করতেন।

ষষ্ঠত, এখানে দানকৃত ভূমি রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে বিবৃতি দেওয়া হতো এবং শাস্ত্রোক্ত শ্লোকে এর পরিসমাপ্তি ঘটতো। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই পর্বে শাসনের তারিখ উল্লিখিত আছে। স্থানীয় রাজসরকারের সীলমোহর দ্বারা এইসব পট্টোলী নিয়মানুযায়ী পট্টীকৃত আধুনিক ভাষায় রেজিস্ট্রি করা হতো।

খ্রিস্টোত্তর অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত লিপিগুলির মধ্যে যতগুলি শাসনের মতবাদ আমরা জানি, তার সবকটিই ভূমিদানের শাসন, ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের শাসন একটিও নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধর্মপালের খালিসপুর লিপিটির উল্লেখ করা যেতে পারে। মাহসমান্তাধিপতি শ্রীনারায়ণ বর্মা একটি নারায়ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন; যার রক্ষণাবেক্ষণ ও পূজার দৈন্যন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি যুবরাজ ত্রিভুবন পালকে দিয়ে রাজার কাছে চারটি গ্রাম প্রার্থনা করেন, এবং প্রার্থনানুযায়ী রাজা গ্রামগুলো দান করেন। এ থেকে ধারণা জন্মায় রাজা যেন স্বেচ্ছায় ভূমি দান করেছেন। অথবা, এমনও হতে পারে, অনুরোধ বা প্রার্থনা করা হয়েছিলো, কিন্তু তা বাহুল্য অনুক্ষণে উল্লিখিত হয়নি। পাল আমলে ধর্ম প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কোথাও কোথাও ভূমিদানের নজির লক্ষ্য করা যায়, যদিও ব্যক্তিগতভাবে ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। কিন্তু সেন আমলে প্রায় সব দানই ছিলো ব্যক্তিগত দান এবং দানের উপলক্ষ হতো কোন ধর্মানুষ্ঠানের আচরণ। সাধারণত ব্রাহ্মণরাই সেন রাজাদের দানগ্রহীতা হতো। এই ধরণের দান ব্রাহ্মণ দক্ষিণা জাতীয় হওয়ায় এখানে ভূমিদান গ্রহণের অনুরোধ জ্ঞাপনের কোন সুযোগ ছিলো না। যে সব ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য ভূমি প্রয়োজন হতো সেখানে প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা রাজাকে ভূমিদানের অনুরোধ জানাতেন এবং

রাজাও সেই অনুরোধ রক্ষা করতেন। রাজা যেখানে নিজেই প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা এবং স্বেচ্ছায় ভূমিদান করতেন, সেখানে কোন ধরণের অনুরোধ জ্ঞাপনের সুযোগ ছিলো না (রায়, ১৪০২)।

এই পর্বের লিপিগুলিতে দেখা যায়, সর্বত্রই রাজা স্বয়ং ভূমিদান করতেন। কিন্তু সপ্তম-অষ্টম শতকের পূর্বের লিপিগুলিতে এর ঠিক বিপরীত চিত্র লক্ষ্য করা যায়। এ সময় ধর্মপ্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য গৃহস্থগণই ভূমিদান করতেন এবং দানের পূর্বে সেই ভূমি রাজার কাছ থেকে মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে ক্রয় করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রেতার পক্ষে রাজাও ভূমিদান করতেন; এ ক্ষেত্রে তিনি শুধু দানকার্যের পূণ্যের ষষ্ঠভাগ (ধর্মষড়ভাগ) লাভ করতেন। এর অর্থ হচ্ছে, সপ্তম শতকের পূর্ব পর্যন্ত গৃহস্থগণই ধর্ম প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ ভূমিদান করেছেন। এর অন্তর্নিহিত কারণ ছিলো পুরজনপদবাসী (নগরবাসী) গৃহস্থরাই ব্যক্তিগতভাবে এসকল ধর্মপ্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করতেন। পরবর্তীতে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রাজা সেই দায়িত্ব গ্রহণ করা শুরু করেন (রায়, ১৪০২)।

রামকৃষ্ণ মুখার্জী (১৯৫৭) এই অবস্থার পিছনে দুইটি কারণ চিহ্নিত করেছেন। প্রথমত, গ্রাম সম্প্রদায় ব্যবস্থার মধ্যে একজন ব্যক্তির পক্ষে স্ব-মালিকানা ও স্ব-নিয়োজিত কৃষক হওয়া কষ্টকর ছিলো না। এই কারণে ভূমিমালিকদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ভাগচাষী ও কৃষি শ্রমিক খুব বেশি পরিমাণে যোগান দিতে পারতেন না। তৎকালীন সময়ে কৃষি উৎপাদনের প্রধান উপকরণ ভূমি পর্যাপ্ত ছিলো এবং ভূমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ছিলো না। এসময় কৃষি উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ যেমন লাঙল, গরু, মহিষ ইত্যাদি যোগান দিতে খুব বেশি পুঁজির প্রয়োজন হতো না। সেহেতু কৃষকরা ভাগচাষী বা কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে পছন্দ করতো না। দ্বিতীয়ত, গ্রামীণ এলাকার মানুষ নিজেদের ভোগের জন্য উৎপাদন করতো এবং কৃষি উৎপাদনের জন্য কোন ধরণের স্থানীয় বা বহিঃবাণিজ্যের ব্যবস্থাও ছিলো না। সে কারণে ভূমি মালিকরা অধিক পরিমাণ পণ্য উৎপাদনেও মনোযোগী হতো না। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা তাদেরকে প্রদত্ত জমি ভাগচাষের মাধ্যমে উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করতো। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কর্তৃক ভাগচাষের মাধ্যমে উৎপাদনের নজির এতোই নগণ্য ছিলো যে, এর ফলে সমাজের মৌলিক উৎপাদন সম্পর্কে বিশেষ কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। অর্থাৎ এই ভাগচাষ ব্যবস্থা সত্ত্বেও প্রাচীন বাংলার গ্রামীণ সম্প্রদায়ের স্ব-মালিকানা, স্ব-নিয়োজিত ও স্ব-নির্ভর অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ অপরিবর্তিত ছিলো (Mukharjee, 1957)।

মুসলিম শাসনামল

১২০৪ সালে ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয়। পরবর্তীতে বলবনী , ফিরোজশাহী, ইলিয়াস শাহী, বায়েজীদ শাহী, রাজা গণেশ, মাহমুদ শাহী, হোসেনশাহী বংশের শাসকগণ এদেশ পরিচালনা করেন। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি থেকে বাদশাহ হুমায়ুনের শাসনের মাধ্যমে বাংলায় মোগল শাসনের সূচনা হয়। ভারতে মোগল শাসকগণ প্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থা নতুন কিছু ছিলো না। তারা এখানে মুসলিম শাসনামলে ইরাক, সিরিয়া ও মিশরে প্রচলিত ভূমিব্যবস্থাই প্রচলনের প্রয়াস পান।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা মহামতি হজরত ওমর (রাঃ) এর আমলে আরবের বাইরে কোনো দেশ জয় করা হলে সেখানকার ভূমিকর, ভূমিব্যবস্থা ও ভূমিস্বত্ব এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখা হতো। তখন ভূমি মালিকানা সংক্রান্ত মূলনীতিতে জমির মালিকানা স্থানীয় জনসাধারণের কাছে ন্যস্ত করার

সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাশাপাশি খলিফা কর্তৃক 'খিরাজ' ধার্য করা এবং সামরিক বাহিনীতে কাজ করার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য মাথাপিছু জিজিয়া ধার্য করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সওয়াজের জমির স্বত্ব-স্বামিত্ব এই জমিতে বসবাসকারীদেও উপরই ন্যস্ত হয়; তাদের ইচ্ছামত এসব জমি বিক্রয় বা দখলের এখতিয়ার প্রদান করা হয়। উপযুপরি সামরিক অভিযান ও বিজয়ের ফলে সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক পরিবর্তন কৃষকের সেজন্য কোন চিন্তা বা আশঙ্কার কারণ হয়নি। এমনকি অনতিদূরে যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায়ও কৃষক হয়ত নিশ্চিন্তমনে নিজজমি চাষে নিবিষ্ট থাকতে পারতো। অন্য কারো নিরাপত্তার নিশ্চিত না থাকলেও কৃষক ও তার লাঙ্গলের নিরাপত্তা সর্বদা অলঙ্ঘনীয় ছিলো (হবিব, ১৯৮৫)।।

উপরিউক্ত ব্যবস্থার আলোকে, প্রথমে ফিরোজ শাহ্ তোঘলক (১৩০৯-১৩৮৮), পরে শের শাহ্ (১৪৮৬–১৫৪৫) এবং শেষে মোগল সম্রাট আকবর (১৫৪২-১৬০৫) ভূমি ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন ও দক্ষতা বৃদ্ধি করেন। জমির মালিকানা, পরিমাণ ও উর্বরাশক্তি, এবং কোন জমিতে কি কি ফসল হয় সে সম্পর্কে প্রথম ব্যাপক জরিপ চালানো হয় এবং তারপর প্রজার সঙ্গতির ভিত্তিতে খাজনা ধার্য করা হয়। বন্যা, প্লাবন বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ক্ষতি হলে খাজনা কমিয়ে দেয়ার বিধান রাখা হয়। এই সকল বিষয় পরিচালনার জন্য একদল কর্মচারী নিয়োগ করা হয় এবং তাদের কাজ তদারক করার দায়িত্ব অপর একদল কর্মচারীর উপর ন্যস্ত হয় (হক, ১৯৯২)। সম্রাট আকবর তার অর্থমন্ত্রী টোডরমল (১৫৫৫–১৫৮৯) এর মাধ্যমে যে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলন করেন তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিলো : জমিকে উর্বরতা অনুযায়ী ৩টি শ্রেণিতে নির্দিষ্টকরণ; জমি মাপার একটা নির্দিষ্ট মাপকাঠি তৈরি; ৭ বছরের উৎপন্ন ফসলের গড় করে আসল জমার নির্ধারণ এবং টাকায় খাজনা নেওয়ার পদ্ধতি প্রবর্তন (চৌধুরী, ১৯৮১)। এ থেকে অনুধাবন করা যে, মোগল শাসনামলেই বাংলায় জমিদারি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় (হবিব, ১৯৮৫)।

মোগল শাসনামলে ভূমিতে মোট উৎপাদিত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ খাজনা নির্ধারিত হতো । তখন ভূমির মালিকানার তুলনায় ভূমিস্বত্বই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। ভূমির পর্যাপ্ততা ও বাজার অর্থনীতির অনুপস্থিতিতে তখনকার সমাজব্যবস্থাও ছিলো স্বয়ংসম্পূর্ণ। জমিদারদের কাজ ছিলো বছর শেষে জমির খাজনা আদায় করা। এখানে বলা প্রয়োজন যে, জমিদার শব্দটি হচ্ছে পারস্য শব্দ, যার অর্থ হলো জমির মালিক। কিন্তু মোগল আমলে জমিদাররা জমির মালিক ছিলেন না (Islam, 1988)। বিভিন্ন তাত্ত্বিকরা সে সময়কার জমিদারদের সামাজিক অবস্থান, মর্যাদা ও ভূমিকা নির্দেশ করতে গিয়ে Baden-Powell (as cited in Mukherjee, 1957, p. 24) বলেন:

> The Mughal revenue-system is the direct cause of the (unforeseen) growth of the Zamindar landlord of Bengal. The Mughals closely conformed to the old Hindu system. And their ideas of collecting taxes and tributes fell in with the system of the land-revenue payment already in force.

গোলাম হাসান বলেন, 'The emperor is proprietor of the revenue; he is not proprietor of the soil.' ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে তারা ছিলেন ধনী, শক্তিশালী এবং সংখ্যায় অনেক। স্যার জন সোর (Sir John Shore) বলেন, 'The relation of a Zamindar to Government and of a Ryot to Zamindar is neither that of a proprietor nor a vassal but a component of both.' (চৌধুরী, ১৯৮১)। কোন কৃষককে জমি থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত উচ্ছেদ করা যেতো না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা খাজনা পরিশোধ করতে পারত

(Bhaumik, 1993; হবিব, ১৯৮৫)। তখন মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ বেশি ছিলো। কারণ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বসতি স্থাপনের জন্য অন্যের সহায়তা তখনকার সময় অত্যন্ত জরুরি ছিলো (হবিব, ১৯৮৫)।

বৃটিশ শাসনামল

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশির যুদ্ধে সিরাজের পতনের মাধ্যমে বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনা শুরু হয়। পরবর্তীতে মীর জাফর এবং মীর কাশিম বাংলার নবাব হলেও প্রকৃতপক্ষে ১৭৬৫ সালে বাংলায় নবাবী শাসনামল শেষ হয় এবং বৃটিশ শাসনামল জোরালো হতে শুরু করে (মজুমদার, ১৯৯৮)। বৃটিশরা এখানে রোমান সভ্যতা থেকে প্রাপ্য ভূমি সম্পর্কিত আইন-কানুন প্রচলন করার সিদ্ধান্ত নেন।

রোমান আইনে সম্পত্তির মালিকানা অর্জনের স্বাভাবিক উপায় ছিলো দখল করা। ভোগ করার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ সর্বপ্রথম কোনো জমি দখল করলে সে তার মালিকানা অর্জন করতো; রোমান আইনবিদগণ এই মালিকানা সমর্থন করতেন। রোমের প্রাচীন আইনবিদগণ লক্ষ্য করেন যে, তাদের প্রতিবেশী অন্যান্য সমাজেও এভাবে মালিকানা অর্জনের রীতি স্বীকৃত হয়েছে। পরবর্তীকালের আইনবিদগণ এই রীতিকে আইনগত স্বীকৃতি দান করেন। তারা স্পষ্টতই বিশ্বাস করতেন যে, দখল করাই হচ্ছে মানুষের অন্যতম প্রথম কাজ ও অধিকার। এই দখল প্রক্রিয়া থেকেই প্রাচীন জগতের মালিকবিহীন জমি ক্রমশ মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ী ও মূল দখলকারের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি হয়। রোমান আইনবিদগণ তখন স্বত্ব ও দখলের মধ্যে পার্থক্য উদ্ভাবন করে এই সমস্যার মোকাবেলা করেন। দখলকারদের দখল অব্যাহত রাখার জন্য আইনগত নিরাপত্তার বিধান করা হয়। এই বিধান থেকেই ক্রমশ রেওয়াজী অধিকার ও বৈধ অধিকারের ভিত্তি গড়ে ওঠে। ইংল্যান্ডেও ঠিক একই ধরণের একটি বিধান গড়ে ওঠে। ব্ল্যাকস্টোন এর মতে, ঈশ্বরের দান হিসেবে পৃথিবী ও তার সমুদয় প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। কেউ এরূপ প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সর্বপ্রথম শুরু করলে প্রাকৃতিক নিয়মে তার উপর তার একটি সাময়িক স্বত্ব সৃষ্টি হয় এবং যতদিন পর্যন্ত সে এই সম্পদ ব্যবহার করে ততদিন তা বলবৎ থাকে। যতদিন দখল থাকে, ততদিন দখলিস্বত্বও বজায় থাকে। বিশ্রাম, ছায়া বা অনুরূপ উদ্দেশ্যে কেউ কোনো জায়গা দখল করলে, তার উপর তার সাময়িক মালিকানা স্বত্ব সৃষ্টি হয় এবং সেখান থেকে তাকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী। তবে সে দখল ত্যাগ করার পর অন্য যেকোন ব্যক্তি সেই জায়গা দখল করতে পারে, এবং এইরূপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দখলকারীর কর্মকাণ্ড কোনো অন্যায় বলে বিবেচিত হবে না (হক, ১৯৯২)।

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার (১৭৩৩-১৭৫৭) পরাজয়ের পরে বাংলার শাসনক্ষমতা মূলত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্বে চলে যায়, যদিও তারা শাসনভার নিজ হাতে না নিয়ে পুতুল নবাব দিয়ে শাসন পরিচালনা করতে থাকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সৈন্যবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য ২৪ পরগনার রাজস্ব আদায় নিজের কর্তৃত্বে নিয়ে নেয় এবং পরে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়েরও কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। তাই ১৭৭০ সালের (বাংলা ১১৭৬ সাল) মন্বন্তরের দায়ভার শুধুমাত্র জমিদারদের উপর চাপালে সত্যকে চাপা দেয়া হবে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যাবতীয় স্থানীয় ব্যয় এবং বিদেশে পণ্য রপ্তানি বাবদ ব্যয়ও এখান থেকেই যোগান দেয়া হতো। এর শোচনীয় পরিণতি 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। এই মন্বন্তরে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করে এবং এক তৃতীয়াংশ চাষের জমি পতিত হয়ে পড়ে। বিষয়টি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর এবং ব্রিটিশ সরকারকে ভাবিয়ে তোলে। তাই পরীক্ষামূলকভাবে ১৭৭১ সালে পাঁচসালা বন্দোবস্তের ব্যবস্থা প্রচলন করা

হয়। ১৭৮৪ সালে 'পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট' পাস হয়।[১] ১৭৮৬ সালের এপ্রিলে গর্ভনর জেনারেল ও তার কাউন্সিলকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরস এর অফিসিয়াল নির্দেশ পাঠানো হয়। এই নির্দেশে বলা হয় যে, জমিদারদের সাথে রাজস্বের ব্যাপারে একটা চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করা হউক। ১৭৮৬ সালের সেপ্টেম্বরে লর্ড কর্নওয়ালিস গভর্নর জেনারেল পদে যোগ দিয়েই বাংলার রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করেন এবং ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত এই অনুসন্ধান অব্যাহত থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি দশসালা বন্দোবস্তের জন্য রেগুলেশন তৈরির নির্দেশ দেন। ১৭৯২ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর কোর্ট অব ডিরেক্টরস প্রেরিত দশসালা বন্দোবস্তের নির্দেশনার আলোকে লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালের ২২শে মার্চ ফরমান জারির মাধ্যমে দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করেন (চৌধুরী, ১৯৮১)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল ও কুফল নিয়ে তাত্ত্বিকদের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন তাত্ত্বিকের মতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন এবং সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন বয়ে আনতে সহায়ক ছিলো। আবার কোন কোন তাত্ত্বিকের ধারণায়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে বৃটিশরা বাৎসরিক আয় নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে তাদের শাসনক্ষমতা পাকাপোক্ত করার প্রয়াস পেয়েছে মাত্র। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে স্কটিশ চিন্তাবিদ ও ঐতিহাসিক আলেকজান্ডার দাও প্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করেন। দাও এর ধারণায়, ইংরেজ রাজত্বের পত্তন থেকে বাংলার অর্থনৈতিক অধঃপতন শুরু হয়। তার মতে, মোগল আমলে বাংলাদেশ ছিলো অতিশয় সমৃদ্ধিশালী। এ সমৃদ্ধির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দাও এদেশ থেকে বিদেশি বণিকদের প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ সোনারুপা পাচার বন্ধ এবং দ্বৈতশাসনের অবসান করে একটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুপারিশ করেন। দাও মনে করেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে যদি জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং তার পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা হয় তবে বাংলায় পূর্বের মতো অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসবে।

আলেকজান্ডার দাওয়ের মতো হেনরি প্রেটুলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রেটুলে ছিলেন একজন ফিজিওক্রেট এবং একজন কৃষিবিশেষজ্ঞ। ফিজিওক্রেট হিসেবে তিনি বিশ্বাস করতেন কৃষিই সমস্ত সম্পদ ও সুখের উৎস। তাঁর মতে, জমি ও কৃষি সব পদমর্যাদার মানুষকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখে এবং জমি ও কৃষিই হচ্ছে সমস্ত রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস। জমিই হলো একটা দেশের আসল ধন। জমি থেকে নিয়মিত আয় না হলে অন্যান্য ধনরত্ন মূল্যহীন হয়ে পড়ে। ব্যাংক ও ব্যাংকাররা তখন নিতান্ত নিরুপায় থাকে। তাদের ধনরত্ন মানুষের কোন কাজে আসেনা। জমি থেকে খাদ্য ফলানো না হলে বিরলতম হীরামুক্তা তখন বোকামির বুদবুদ হয়ে উপহাস করে। তিনি আরো বলেন যে, কৃষক তখনই মাটিকে উর্বর করে শস্য ও ফুলে-ফলে ভরে তোলে যখন সে দেখতে পায় তার পরিশ্রমের ফল কেউ কেড়ে নেয় না, কেউ তার বাড়তি আয়ের উপর হাত বাড়ায় না। কিন্তু তার অভিযোগ, বাংলাদেশে বৃটিশ সরকার সে পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি। এখানে প্রতিবছর খাজনা বৃদ্ধি করে ও জমি নিলামে বন্দোবস্ত করে কৃষি ও কৃষকের ধ্বংস সাধন করা হচ্ছে। এ ধ্বংসের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হিসেবে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুপারিশ করেন (ইসলাম, ১৯৭৫)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নেপথ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিলো দেশের অধিবাসিগণের মধ্য থেকে

[১]তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী William Pitt, the Younger, (1759—1806) এর নামে এই আইনটি পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নামে পরিচিত।

এমন একটি নতুন শ্রেণি তৈরি করা যে শ্রেণি এদেশে ইংরেজ শাসনের একটি সুদৃঢ় স্তম্ভরূপে দণ্ডায়মান থেকে জনসাধারণ তথা বিদ্রোহী কৃষকের ক্রোধানল থেকে এই শাসন রক্ষা করতে সহায়তা করবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ভারতবর্ষের সকল অধিকৃত অঞ্চলে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জেগে ওঠা কৃষক বিদ্রোহ মোকাবেলা করা দেশীয় সমর্থকহীন একক ইংরেজ শক্তির পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো। এই গুরুতর অবস্থা উপলব্ধি করতে সুচতুর ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ইংরেজ শাসকগণের বিলম্ব হয়নি। এই জন্যই ক্রমবর্ধমান গণবিদ্রোহ থেকে নবপ্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা সুরক্ষার স্বার্থে একদল কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন স্থানীয় সমর্থক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইংরেজ শাসকগণ জমিদার গোষ্ঠীর হাতে নিজেদের কৃষক শোষণের অবাধ অধিকার অর্পণ করেন এবং এইভাবে নবসৃষ্ট জমিদারগোষ্ঠীকে নিজ দলভুক্ত করেন। রজনী পাম দত্তের ভাষায়:

> ইংল্যান্ডের ভূস্বামিগোষ্ঠীর অনুকরণে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের স্তম্ভরূপে একটি নূতন ভূস্বামিশ্রেণীর সৃষ্টি করাই ছিলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল উদ্দেশ্য। শাসকগণ বুঝেছিলেন যে, ইংল্যান্ডে যেমন অল্প সংখ্যক লোক (ভূস্বামী) বিপুল জনসংখ্যাকে দমন করে রাখে, ঠিক সেইরূপ ভারতবর্ষেও ইংরেজ শাসনের একটি সামাজিক ভিত্তি (সমর্থন) গঠনের উদ্দেশ্যে এরূপ একটি নতুন শ্রেণী সৃষ্টি করা বিশেষ প্রয়োজন, যে শ্রেণী ভূমি সম্পদের একাংশ (মূল পরিকল্পনানুযায়ী এক-একাদশমাংশ) ভোগ করে ইংরেজ শাসনের সমস্বার্থ-সম্পন্ন হবে এবং এই শাসনকে চিরকাল রক্ষা করবে । (রায়, ১৯৭৫)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্রমবর্ধমান অর্থের চাহিদা পূর্ণ করা ছিলো জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভূস্বামীশ্রেণি সৃষ্টির পশ্চাতে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। তৎকালে বিবাহ ও বঙ্গদেশের সর্বত্র কৃষক-বিদ্রোহ দমনের জন্য কোম্পানির শাসকগণের অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সেই অর্থ কোম্পানির কর্তাদের পক্ষে ইংল্যান্ড থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিলো না। এমনকি পূর্বের ভূ-সম্পত্তিহীন রাজস্ব আদায়কারী জমিদারগণের দ্বারা কোম্পানির প্রয়োজন অনুযায়ী অধিক রাজস্ব আদায় করাও সম্ভব ছিলো না। অথচ ইংল্যান্ডে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'র অংশীদারগণের ক্রমবর্ধমান লভ্যাংশের দাবিও কোম্পানির বঙ্গদেশস্থিত কর্মচারীগণকে অস্থির করে তোলে (রায়, ১৯৭৫)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করার পিছনে আরও একটা উদ্দেশ্য ছিলো এরকম, যেন ব্যবসা পুঁজি শিল্প পুঁজিতে পরিণত না হয়ে এদেশ শিল্পায়নের দিকে অগ্রসর না হয়। এ প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর বলেন, এ দেশের নতুন ধনিক শ্রেণির সঞ্চিত ধনের একটা গতি করা প্রয়োজন বলে কর্নওয়ালিস মনে করেছিলেন। জমিদারিতে নিরাপদ আয় এবং অতিরিক্ত মুনাফার সুযোগ সৃষ্টি করে কর্নওয়ালিস এ দেশের নতুন বাণিজ্যলব্ধ মূলধনকে স্বাধীন শিল্পায়নের ক্ষেত্র থেকে সনাতন ভূ-সম্পত্তির দিকে ধাবিত করে (উমর, ১৯৭৮; ২০১৬)।

কর্নওয়ালিস কোম্পানি ডিরেক্টরদের উদ্দেশে তার চিঠিতে (৬ মার্চ, ১৯৭৩) সুস্পষ্টভাবে লেখেন: "The large capitals possessed by many of the natives, which they will have no means of employing ... will be applied to the purchase of the landed property as soon as the tenure is dceclared to be secured" (ঘোষ, ১৯৭৫). বিনয় ঘোষের ধারণা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে লর্ড কর্ণওয়ালিসের এই উদ্দেশ্য সফল হয়েছিলো। কর্নওয়ালিস তার চিঠিতে এদেশের ধনিকদের বিষয়ে যে ইঙ্গিত করেছেন, তাঁরা অধিকাংশই কলকাতা শহরের অধিবাসী দেওয়ান, বেনিয়ান ও মুৎসুদ্দি। স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি যথেষ্ট উৎসাহী দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো ব্যক্তিও – শেষ পর্যন্ত তাঁর সঞ্চিত ধন বাণিজ্য থেকে জমিদারি ও ভূ-সম্পত্তিতে নিয়োগ করেছিলেন। অন্যান্য বেনিয়ান বা মুৎসুদ্দিদের কথা বলাই বাহুল্য। রামদুলাল দে, মতিলাল শীল, পাইকপাড়ার রাজা সিংহগণ, হাটখোলার ও রামজাগানের দত্তগণ, প্রায় সকলেই তাদের সঞ্চিত ধনদৌলতে শহর ও গ্রামের জমিদার হন। অর্থাৎ

তারা নাগরিক ও গ্রাম্য ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়ে অনায়াসলব্ধ উপার্জন ও মুনাফা লাভের জন্য লালায়িত হয়ে ওঠেন। শহরের স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতার দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় এর বেশিরভাগ সময় শহরেই থাকতেন। শুধু বিলাসিতার জন্য নয়, নাগরিক সমাজে আভিজাত্য প্রদর্শনের পথ অনেক বেশি উন্মুক্ত ও প্রশস্ত বলেও তাঁরা শহুরে হয়ে গিয়েছিলেন (ঘোষ, ১৯৭৫; উমর, ২০১৬)।

যদিও বৃটিশরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ব্রিটেনের অনুরূপ জমিদার শ্রেণি গড়ে তোলার প্রয়াস পেলেও স্যার কোর্টনি ইলমার্টের বর্ণনায় এই দুই দেশের জমিদারদের মধ্যে বিস্তর ফারাক লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, একজন বৃটিশ প্রজা বৃটিশ জমিদারকে প্রদত্ত খাজনার একটি বড় অংশ ছিলো মূলধনের সুদ এবং ঐ মূলধন দ্বারা পাকা গোলাবাড়ি নির্মাণ, পানি-নিষ্কাশন ব্যবস্থা করা হতো। কিন্তু বাংলাদেশের একজন সাধারণ কৃষক প্রদত্ত খাজনার মধ্যে মূলধনের সুদ থাকতো না। দ্বিতীয়ত, বৃটিশ জমিদার বা তার প্রতিনিধি সঠিকভাবেই তাদের প্রজা, প্রজাদের জমির অবস্থান এবং প্রদত্ত খাজনার পরিমাণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতেন। কিন্তু বাংলাদেশের জমিদারদের এসকল বিষয়ে কোন সঠিক ধারণা থাকতো না। অর্থাৎ বৃটিশ উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী বাংলার জমিদারদের কেবলই রাজস্ব-দাতা ও খাজনা গ্রহীতায় পর্যবসিত করেছিলো (হক, ১৯৯২)।

বৃটিশদের দ্বারা সৃষ্ট এদেশের জমিদাররা দুটি সম্প্রদায়ের লোক ছিলো অর্থাৎ বৃটিশ শাসনামলে এদেশে হিন্দু ও মুসলিম জমিদারই ছিলো। কোনো কোনো তাত্ত্বিকদের মতে, এই জমিদারশ্রেণি অর্থের অপচয় ব্যতীত কোনো ধরণের জনহিতকর কাজই করেননি। আবার কারো কারো ধারণায়, তাঁরা কিছু পরিমাণে জনহিতকর কাজও করেছেন। এদেশের হিন্দু জমিদাররা একটি বাবু সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। এই বাবু কারা? এ প্রসঙ্গে অতুল সুর বলেন, যার চার 'প' পরিপূর্ণ হবে তিনি হাফ বাবু হবেন। চার 'প' হচ্ছে পাশা, পায়রা, পরদার ও পোশাক। এর সঙ্গে যার চার 'খ' পরিপূর্ণ হবে তিনি পুরো বাবু হবেন। চার 'খ' হচ্ছে খুশি, খানকী, খানা, খয়রাত। তিনি আরো উল্লেখ করেন, বাবু সংস্কৃতির সূত্রপাত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে, আর পরিসমাপ্তি ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে। ধারণা করা হয়, প্রথম বাবু ছিলেন কলকাতার কালেক্টরের সহকারী গোবিন্দরাম মিত্র। সিরাজ কর্তৃক কলকাতা আক্রমণের জন্য প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ তালিকায় রতন, ললিতা ও মতি নামে তার তিন রক্ষিতার নাম পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাগবাজারের বিখ্যাত ধনী ভুবনমোহন নিয়োগী[২] মহাশয়ই ছিলেন কলকাতার শেষ বাবু (সুর, ১৯৯১)।

মুনতাসীর মামুন এ প্রসঙ্গে বলেন, চরিত্রগত দিক থেকে হিন্দু-মুসলমান জমিদারদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিলো না। আব্দুস সোবহানের মতো কট্টর হিন্দুবিদ্বেষী লেখকও মুসলমান জমিদারদের সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছিলেন, 'এরা কবুতর উড়িয়ে, মোরগবাজি করে, সতরঞ্জ খেলে বা স্রেফ ঘুমিয়ে দিন কাটান। মোসলমান কুলে জন্মগ্রহণ না করিলে, মোসলমান মহিলাগণ এই আবর্জনাগুলিকে প্রসব না করিলে, সমাজের অধঃপতনের আশঙ্কা কিছু কম হইতো' (মামুন, ১৯৭৫)।

লর্ড কর্নওয়ালিস এমনভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রণয়ন করেছিলেন যেখানে জমিদারগণ কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদনে

[২] তিনি প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপন করেন। তিনি কাগজী 'নোট' পুড়িয়ে সিগারেট ধরাতেন এবং স্বরস্বতী পূজার বিসর্জন উপলক্ষে চিৎপুর রোডের উভয় পার্শ্বস্থ বারাঙ্গনাদের মধ্যে এক হাজার জোড়া বেনারসী শাড়ি বিতরণ করতেন।

একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে। দেশের সাধারণ কৃষকরা নিরক্ষর হওয়ায়, এবং প্রাথমিক শিক্ষার কোনো সুষ্ঠু সংগঠন না থাকায় কর্নওয়ালিস আশা করছিলেন যে, শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান জমিদার শ্রেণি কৃষক ও কৃষিকার্যের দেখাশুনা করবে এবং কৃষকের স্বার্থ ও অধিকারের রক্ষক হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু বাস্তবে এর ভিন্ন চিত্র পাওয়া গেলো। ভূমিব্যবস্থা এখন এমন একটি স্তরে নেমে গেছে, যেখানে জমিদার হয়েছে নিছক খাজনা আদায়কারী, খাজনা থেকেই সে জীবনধারণ করতে চায়, এবং তার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে সর্বাধিক পরিমাণ খাজনা আদায় করা (হক, ১৯৯২)।

সেই সময়কার সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিশেষ করে বিচারপতিরা, জমিদারদের কৃষিতে নেতিবাচক ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে পিছপা হন নি। যার বিবরণ এ ভালভাবে লিপিবদ্ধ করেন। এ প্রসঙ্গে জাস্টিস জর্জ ক্যাম্বেল বলেন:

> বড় বড় জমিদাররা, কদাচিৎ দুই একজন ছাড়া, নিজেদের জমিদারীর উন্নতির জন্য একটি কপর্দকও খরচ করেন না। তিনি নিজে চাষ তো করেনই না, চাষের উন্নতির জন্য নতুন উন্নত কলাকৌশলও প্রয়োগ করতে প্রয়াসী হন না। ইংরেজ জমিদারদের মতো ফার্ম বা ফার্ম-হাউস কিছুই তৈরি করেন না। চাষের জমি ঘিরে দেওয়া, গাছ-গাছড়া ও বীজের ব্যবস্থা করা, নালা-নর্দমা বা সেচের ব্যবস্থা করা - এসব কিছুই তিনি কর্তব্য বলে মনে করেন না। তিনি শুধু চাষীদের নিজেদের খরচে চাষ করার অনুমতি দেন এবং খাজনা ও অন্যান্য যা কিছু তাঁর নিজের পাওনা তা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করেন, যতটা পারেন বেশি করে আদায় করার চেষ্টা করেন। (ঘোষ, ১৯৭৫)

আবার জাস্টিস শম্ভুনাথ পণ্ডিত ১৮৬৫ সালের ১লা জুন বলেন, "বাংলাদেশের জমিদাররা মূলধন নিয়োগ করে তাঁদের জমিদারীর উন্নতি করেছেন, এরকম বড় একটা দেখা যায় না। জমিদাররা একাজ করবেন, একথা আইনে লেখা আছে বটে, কিন্তু জমিদাররা তা কাজে বিশেষ পরিণত করেন নি।" একই সময়ে জাস্টিস সিটনকার বলেন:

> কৃষিকাজের উন্নতির জন্য জমিদাররা কোনরকম দায়িত্ব পালন করেন নি। চাষীদের মূলধন বা বীজ দিয়ে সাহায্য করা, সেচের ব্যবস্থা করা, পথঘাটের উন্নতি করা, এসব কর্তব্য তাঁরা পালন করেন নি। কিছু পুকুর, এখানে ওখানে কিছু পথঘাট, হাট ও গঞ্জ তাঁরা করেছেন বটে, কিন্তু যা করা উচিত ছিলো তার তুলনায় এগুলি কিছুই নয়। বরং অধিকাংশ জায়গায় বনজঙ্গল হাসিল করে চাষীরা নিজেরাই আবাদের জমি বৃদ্ধি করেছে এবং জোতদার ও অবস্থাপন্ন চাষীদের জন্যই খেজুর, আখ, তামাক প্রভৃতির চাষ উন্নত হয়েছে। জমিদারদের জন্য এসব উন্নতি কিছু হয় নি। তাঁহারা শুধু উন্নতির ফলটুকুই ভোগ করেছেন। (ঘোষ, ১৯৭৫)

১৮৭৫ সালে এ বিষয়ে রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফ্ ও আরও ২০জন মিশনারি বলেন, "জমিদাররা চাষীদের সঙ্গে ব্যবহার করেন ঠিক প্রজাদের মতো নয়, কতকটা ক্রীতদাসের মতো। তারা নিজেদের রাজা-মহারাজাদের মতো মনে করেন। প্রজাদের কাছে খাজনাদি যা তাদের ন্যায্য পাওনা, তার চেয়ে অনেক বেশি তারা নানা কৌশলে আদায় করেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে নিজের নানারকমের কাজে প্রজাদের খাটিয়ে নেন। তাছাড়া অত্যাচার যে কত রকমের করেন তা বলে শেষ করা যায় না।" অন্যদিকে তৎকালীন বিশিষ্ট সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জমিদারদের ভালো দিক তুলে ধরার প্রয়াস পান। তার ভাষায়:

> যাঁহারা জমিদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাঁহাদিগের বিরোধী। জমিদারের দ্বারা অনেক সৎকার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। গ্রামে গ্রামে যে এক্ষণে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে, আপামর সাধারণ সকলেই যে আপন আপন গ্রামে বসিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিতেছে; ইহা জমিদারদিগের গুণে। জমিদারেরা অনেক স্থানে চিকিৎসালয়, রাস্তা, অতিথিশালা ইত্যাদির সৃজন করিয়া সাধারণের উপকার করিতেছেন। আমাদিগের দেশের লোকের জন্য যে ভিন্ন জাতীয় রাজপুরুষদিগের সমক্ষে দুটি কথা বলে, সে কেবল

> জমিদারদের ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন জমিদারদের সমাজ। তদ্বারা দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে, তাহা অন্য কোন সম্প্রদায় হইতে হইতেছে না, বা হইবারও সম্ভবনা দেখা যায় না। অতএব জমিদারদিগের কেবল নিন্দা করা অতি অন্যায়পরতার কাজ। এই সম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন লোকের দ্বারা যে প্রজা পীড়ন হয়, ইহাই তাঁহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক। এই কলঙ্ক অপনীত করা জমিদারদিগেরই হাত। (চট্টোপাধ্যায়, ১৩৬১)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শুধুমাত্র সমাজের জন্য হিতকর ছিলো তা নয়, এই ব্যবস্থা সমাজে কৃষির অনুন্নতি, কুটিরশিল্পের ধ্বংস ও অর্থকরী ফসলের প্রচলনসহ নতুন ধরণের বিভিন্ন সমস্যা ও বৈশিষ্ট্যের জন্ম দেয়। এই প্রক্রিয়ার ক্রিয়াশীলতা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রথমত, কৃষির উন্নতির জন্য সেচব্যবস্থার দায়িত্ব জমিদারদের উপর ন্যস্ত থাকলেও তারা এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলো। এর ফলে কৃষিব্যবস্থা ক্রমাগত ধ্বংসের মুখে পতিত হয়; কৃষকদের দুরবস্থা চরমে ওঠে। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় কুটিরশিল্প শিল্পোন্নত ব্রিটেনের অবাধ পণ্য আমদানির প্রতিযোগিতার মুখে ধ্বংস হতে থাকে। কুটিরশিল্প শ্রমিকরা অনন্যোপায় হয়ে জীবিকার জন্য কৃষিজমিতে ধাবিত হয়। তৃতীয়ত, এই সময়ে নীলচাষ প্রবর্তনের কারণেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কৃষিজমি নীল চাষের কাজে বিনিয়োজিত হয়। উল্লেখ্য, ১৭৭৭ সালে মর্শিয়ে লুই বন্নো বাংলায় প্রথম নীলচাষ শুরু করেন এবং ১৭৭৮ সালে প্রথম নীলকুঠি স্থাপিত হয় (চৌধুরী, n.d.)।

বৃটিশ শাসকেরা উপনিবেশ স্থাপনের পর স্বীয় স্বার্থে রেললাইন স্থাপন এবং বাজার ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করে। তারা নিজেদের শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহের জন্য এদেশে রেললাইন স্থাপন করে এবং কৃষকদেরকে পণ্য উৎপাদনে মনোনিবেশ করায়। এই প্রক্রিয়ায় একদিকে নীলচাষ শুরু হয় এবং অন্যদিকে বাজার ব্যবস্থার প্রসার ঘটে। এর মাধ্যমে আমাদের কুটিরশিল্প ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। আর তাদের এই উদ্দেশ্য সফল করতে তাদের সৃষ্ট জমিদার শ্রেণি সহযোগী ভূমিকা পালন করে। এই উদ্দেশ্যে বৃটিশরা জমিদারদেরকে প্রচুর ক্ষমতা প্রদান করে। এক পর্যায়ে জমিদাররা অমিতাচারী ও বিলাসী জীবনযাপন শুরু করে। এর ফলে তারা প্রায়শই তাদের নামে বরাদ্দকৃত জমির খাজনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়। তখন সরকার এসব জমিদারদের নামে বরাদ্দকৃত জমি নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এভাবে জমি ক্রমান্বয়ে ব্যক্তিগত মালিকানার আওতায় চলে আসতে থাকে। ১৭৯৯, ১৮১২, ১৮২২ এবং ১৮৪৪ সালের বিভিন্ন আইনে জমিদারদের উপর আরো বেশি ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। ১৮১৯ সালে 'পত্তনি' ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। অর্থাৎ জমিদার তার জমি অন্যকে প্রদান করার মাধ্যমে জমির খাজনা আদায় করতে পারবে। এর ফলে সমাজে পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, সেপত্তনীদার ও চাহার পত্তনীদার নামে বিভিন্ন শ্রেণির সৃষ্টি হয়। এরাই তখন মধ্যস্বত্বভোগী ও জোতদার বলে পরিচিত ছিলো।

ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ক্রমাগত নীলবিদ্রোহ (১৮৫৯-৬২), তিতুমীর বিদ্রোহ (১৮৩১), ফরায়েজী আন্দোলন (১৮৩১-১৮৪০) ও সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) মতো প্রতিরোধ আন্দোলন জেগে ওঠে। সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার ক্ষমতা হারায় এবং এই ক্ষমতা রানি ভিক্টোরিয়ার উপর ন্যস্ত হয়। ১৮৫৯ সালে প্রণীত Bengal Rent Act এর মাধ্যমে জমিদারদের উপর অর্পিত করারোপকে কিছুটা লাঘব করা হয়। ১৯৩০ এর মহামন্দা ফলে ধান ও পাটের দাম কমতে থাকে এবং এর সাথে সাথে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থাও ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। মানুষের মধ্যে এই ধারণা জন্মায় – চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৩৮ সালে প্রণীত Bengal Tenancy (Amendment) Act এর মাধ্যমে প্রজাদের কিছু সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়। এই অ্যাক্ট এর মাধ্যমে সুদের হার হ্রাস করে ১৮% করা হয় এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ রহিত করা

হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত টিকে থাকবে কিনা তা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে ১৯৪০ সালে Floud Commission গঠিত হয়। ১৯৪৩ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হলে এর দায় পুরোপুরি বৃটিশ সরকারের উপর আরোপিত হয়। দুর্ভিক্ষ, মহামন্দা, স্বাধিকার আন্দোলন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লোপ পেতে থাকে। এদেশের মানুষ স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ শাসকদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে (Chatterjee, 1986; CARE, 2003; Islam, 2012; Islam, 2013)।

পাকিস্তান আমল

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯৫০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের বিধান সম্বলিত State Acquisition and Tenancy Act, 1950 পাস করা হয়। এই আইনে ক্ষতিপূরণ সহকারে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ এবং রায়তরা সরাসরি সরকারের কাছে খাজনা দিতে পারবে এই বিধান গৃহীত হয়। এর ফলে এতদিন সরকার এবং প্রজাদের মধ্যে যে মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার, তালুকদার ছিলো তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। এই আইনে একটি কৃষক পরিবারের নিজ মালিকানায় জমির সর্বোচ্চ সীমা ১০০ বিঘা নির্ধারণ করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত ফসল তথা ধানের উপর খাজনা দেওয়ার প্রচলিত প্রথা বাতিল করা হয়। ১৯৫০ সালে জমিদারি উচ্ছেদ আইন পাস হলেও এর বাস্তবায়ন অনেক বিলম্বিত হয়। ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই কেবল এই আইন বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। জমিদারি উচ্ছেদ আইনটির যুগান্তরী প্রভাব সত্ত্বেও এই আইনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো – এই আইনে জোতদার এবং মহাজনী ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন প্রতিবিধান ছিলো না। ১৯৫৮'র সামরিক শাসনোত্তর আইয়ুব সরকার ১৯৬১ সালে পরিবার পিছু জমির সর্বোচ্চ সীমা ১০০ বিঘার পরিবর্তে ৩৭৫ বিঘা নির্ধারণ করেন (রায়, ১৯৮৩; Azad, 1990; Islam, Moula and Islam, 2015; Herrera, 2016)। আইয়ুব খান এই আইনের মাধ্যমে বস্তুত মুসলিম জোতদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়াস পান। তার অভিপ্রায় ছিলো, আনুকূল্যপ্রাপ্ত হিন্দু জমিদাররা যেভাবে বৃটিশ সরকারকে সহায়তা করেছিলো মুসলিম জোতদাররাও তেমনিভাবে আইয়ুবের শাসনক্ষমতার পক্ষাবলম্বন করবে।

স্বাধীনতা উত্তরকাল

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ সরকার কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৯৭২ সালে সকল সার্টিফিকেট মামলা বাতিল, ২৫ বিঘার কম কৃষি খামারের খাজনা মওকুফ এবং জমির সর্বোচ্চ সিলিং ১০০ বিঘা নির্ধারণ করা হয় (Azad, 1990; CARE, 2003)। স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদদের নিয়ে গঠিত পরিকল্পনা কমিশন ১৯৭৩ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলে বলা হয়: "বাংলাদেশ সমাজতন্ত্রকে চারটি মৌল রাষ্ট্রীয় নীতির অন্যতম হিসেবে গ্রহণ করেছে। সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর দিকে উত্তরণের জন্য অনেকগুলি কাঠামোগত পরিবর্তন প্রয়োজন পড়বে যার কেন্দ্রবিন্দু হবে ভূমি-সংস্কার।" প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হলেও কৃষিতে বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তনের কোন নির্দেশনা এই পরিকল্পনায় উপস্থাপিত হয়নি। পরিবার পিছু জমির উচ্চতম সিলিং ১০০ বিঘায় পুনঃনির্ধারণ; হাট-বাজারের ও জলমহালের ইজারা প্রথা বিলোপ; ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকদের ভূমি-রাজস্ব রদ করা হলেও কৃষকদের উপর আরোপিত অন্যান্য ট্যাক্স অব্যাহত থাকে (রায়, ১৯৮৩)।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সূচনা হয় এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি থেকে সমাজতন্ত্র অপসারিত হয়। নতুন সরকার সরাসরি জমির খাজনা প্রচলন করার পরিবর্তে ভূমি উন্নয়ন কর নামে নতুন কর প্রচলন করে। ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ সামরিক আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর ভূমি আইনের আমুল পরিবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে কৃষিমন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে ১৪ সদস্যের একটি ভূমিসংস্কার বাস্তবায়ন জাতীয় কমিটি গঠন করে। পরে তৎকালীন উপ-প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদকে সভাপতি করে ২০ সদস্য বিশিষ্ট পুনর্গঠিত ভূমিসংস্কার বাস্তবায়ন জাতীয় কমিটি ঘোষিত হয়। উক্ত কমিটির আলোচনা ও সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৮৪ সালের ২৬শে জানুয়ারি Land Reform Ordinance, 1984 জারি করা হয় যা একই বছর ১৪ই এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়। এই অর্ডিন্যান্সের প্রধান দিক ছিলো ৬০ বিঘার অতিরিক্ত জমি অর্জনে বিধিনিষেধ এবং বেনামিতে জমির মালিকানা অর্জনে বিধিনিষেধ ইত্যাদি (ব্র্যাক, ১৯৯০; Hussain, 1995; CARE, 2003)। রাষ্ট্রপতি হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ শুধুমাত্র ভূমিসংস্কার আইনকে বাস্তবায়িত করার জন্য আইন প্রণয়ন করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বণ্টনেরও উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৭ সালের ৫ই মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে সুনামগঞ্জে ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বণ্টন কর্মসূচি উদ্বোধন এবং ১৯৮৮ সালে গুচ্ছগ্রাম কর্মসূচির মাধ্যমে খাসজমিতে ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসন কাজ শুরু করেন (ব্র্যাক, ১৯৯০; Herrera, 2016)।

মূল আলোচনা

প্রাচীন বাংলার স্বয়ংসম্পূণ গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষক নিজস্ব প্রয়োজন ব্যতিরেকে অতিরিক্ত উৎপাদনে অনিচ্ছুক ছিলো। কৃষির যান্ত্রিকীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ ব্যবস্থা বিকশিত না হওয়ায় তৎকালীন সময়ে কৃষি জমির মালিকানা নিয়ে কৃষকদের মধ্যে খুব বেশি উৎসাহ লক্ষ্য করা যেতো না। আর এ কারণেও তাদের মধ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উৎসাহের অভাব দেখা যেতো (Childe, 1947; Mukharjee, 1957; Desai, 1966; Karim, 1976; ইসলাম, ২০০৩ক)। হিন্দু শাসকেরাই বাংলায় প্রথমবারের মতো জমিতে খাজনা ব্যবস্থা প্রচলন করেন (CARE, 2003)। মোগল শাসকগণ ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে থেকে আগমন করলেও তারা অনেক বেশি প্রজাদরদি এবং এদেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নতির প্রয়াসে মনোযোগী ছিলেন। কৃষকদের বিপদের সময় খাজনা আদায়ের জন্য পীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের রীতি না থাকায় মোগল আমলে কৃষকেরা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাধারণত কম মনোযোগী হতো। বাজারব্যবস্থা প্রসারের অভাবও এসময় কৃষকদেরকে কৃষির প্রতি অধিকতর মনোনিবেশে বাধ্য করেনি। ফলে মোগল শাসনামলে বাংলার কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না (Bhaumik, 1993; বারকাত ও রায়, ২০০৬)। বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তি উপমহাদেশে ক্ষমতা অধিষ্ঠানের প্রথম দিকে মোগল শাসকদের প্রবর্তিত রাজস্ব ব্যবস্থা অব্যাহত রাখে (Hussain, 1995)।

পরবর্তীতে তারা বাৎসরিক নির্দিষ্ট আয় নিশ্চিত করার জন্য জমিতে চিরস্থায়ী মালিকানাস্বত্ব প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর মাধ্যমে তারা জমিদারি ব্যবস্থাকে আরো পাকাপোক্ত ভিত্তি প্রদান করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো এমন একটি শ্রেণি তৈরি করা যারা তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকতে সহায়তা করবে। তারা আরো মনে করেছিলো, এদেশের সাধারণ কৃষকরা নিরক্ষর হওয়ায় শিক্ষিত জমিদারদের উপর জমির কর্তৃত্ব ন্যস্ত হলে জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এর ফলাফল হিতে বিপরীত হয়। হিন্দু ও মুসলিম উভয় জমিদাররা বেশি অত্যাচারী ও অলস হয়ে পড়ে। দেশীয় শিল্প ধ্বংসসাধন, বাজার অর্থনীতির বিকাশ ও নীলচাষসহ কৃষিতে অর্থকরী

ফসলের প্রচলন অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে আরো প্রলম্বিত করে। এর প্রতিক্রিয়ায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। বৃটিশ শাসকেরা এসব বিদ্রোহ দমনে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসার, অর্থনৈতিক অধোগতি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধসহ এশিয়া ও আফ্রিকার দেশে দেশে উপনিবেশিক শাসনের অবসানের পটভূমিতে উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে। মূলত বৃটিশের উপনিবেশিক শাসনকাঠামোর মধ্যে বাংলার স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি অর্থনীতি বাজার নির্ভর অর্থনীতিতে পর্যবসিত হতে শুরু করে (ইসলাম, ২০০৩খ)। ফলে কৃষকের সঙ্গে কৃষকের সম্পর্কের তুলনায় কৃষকের সঙ্গে বাজারের সম্পর্কের গুরুত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে কৃষকেরা সাধারণ শস্যের তুলনায় অর্থকরী শস্য তথা পণ্য উৎপাদনে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করে (Chatterjee, 1986; Mondal, 2014; Rouf, Ali and Saifullah, 2015)।

ভারতীয় উপমহাদেশ দুইটি অংশে বিভক্তির পর বাংলাদেশ পাকিস্তানের অর্ন্তভুক্ত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরে East Bengal State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর আওতায় বাংলাদেশে জমিদারি প্রথা বাতিল করা হয়। এভাবে বাংলার কৃষক জমিদারদের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পায়। যদিও পরিবারপ্রতি জমির সিলিং নির্ধারিত হলেও বিভিন্ন আইনী জটিলতা ও অজুহাতে জমির মালিকনার পূর্বাবস্থা অর্থাৎ জমিতে জোতদার শ্রেণির কর্তৃত্ব বহাল থাকে। কৃষিতে বাজার ব্যবস্থা প্রচলনের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা এই জোতদার শ্রেণির পক্ষে অনুকূল হয়ে ওঠে। তাদের পক্ষে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপতি ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেওয়াও সম্ভব হয়। একই পরিবারের মধ্যে জমির হাত-বদল ও পুঁজির যোগান দেওয়ার করণে কৃষিতে জোতদার শ্রেণির আধিপত্য বজায় থাকে। এর অর্থ হচ্ছে সাধারণ কৃষকের অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হয় নি। পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।

বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লিখিত চারটি মূলনীতির মধ্যে সমাজতন্ত্র অন্যতম। এই পটভূমিতে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ভূমি পুনঃবন্টনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর ফলে ভূমিহীন পরিবার ভূমির মালিকানা অর্জনের সুযোগ লাভ করে। কিন্তু ১৯৭৫ এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সংবিধানে সমাজতন্ত্র প্রত্যয়টি 'সামাজিক ন্যায়বিচার' অর্থে ভিন্ন ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত হয়। ১৯৭৫ পরবর্তী সরকার জোতদার শ্রেণিকে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার জন্য জমির মালিকানার সিলিং বর্ধিত করে। জমিতে অধিকতর পুঁজি বিনিয়োগে সক্ষমদের পক্ষেই জমির মালিকানার বর্ধিত সিলিং এর সুযোগ সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়। এই ধনী কৃষকেরা মূলত শহরে বসবাসকারী জমি বর্গা প্রদানকারী অনুপস্থিত ভূ-স্বামী (absentee landlord) (ঘোষ, ১৯৭৫; উমর, ২০১৬)। বারাকাত (২০১৬) দাবি করেন, বিগত দুই-তিন দশকে বাংলাদেশে অনুপস্থিত ভূ-স্বামীর সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ভূমিহীনের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি কতিপয় ভূ-স্বামীর হাতে ভূ-সম্পদেও কেন্দ্রীকরণও বৃদ্ধি পেয়েছে। বারকাত (২০১৬) দেখান যে, ১৯৬০ সালে এদেশে ভূমিহীন খানার সংখ্যা ছিলো মোট খানার শতকরা ১৯ ভাগ যা ২০০৮ সালে হয়েছে ৫৯ ভাগ। অন্যদিকে ১৯৬০ সালে যেখানে শতকরা ১ ভাগ ভূ-স্বামীর কাছে মোট জমির মালিকানা ছিলো শতকরা ৪.৭ ভাগ, সেখানে ২০০৮ সালে তাদের জমির মালিকানা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে শতকরা ১২ ভাগ।

Tenaw, Islam and Parviainen (2009) এর দাবি অনুযায়ী ভূমি-বিন্যাস কাঠামোর অপরিবর্তনীয়তাই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পথে প্রধান অন্তরায়। বর্তমানে বাংলাদেশে এনজিও এবং কৃষি বহির্ভূত কার্যক্রম প্রসারের ফলে

গ্রামের সাধারণ মানুষের কৃষির উপর নির্ভরশীলতা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী অতীতের মতো জমি ও জলার উপর নির্ভরশীল নয়। এ সকল পরিবর্তনের ফলে কৃষকের সাথে জমির গভীর ও আত্মিক সম্পর্ক ক্রমাগত ক্ষীণতর হতে শুরু করেছে। এই প্রবণতা থেকে অনুমান করা যায় যে, এই সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরো ক্ষীণতর হবে।

উপসংহার

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দু শাসনামলে জমির তুলনায় মানুষের অনুপাত কম থাকায় তখন মানুষ নিজে যা চাষাবাদ করতো তাই তার নিজের বলে মনে করতো। এই অবস্থা বৃটিশ শাসনের প্রথম দিক পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। এসময় মূলত সেচব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনার জন্যই প্রজারা ভূমিকর প্রদান করতো। বৃটিশ শাসনামলের প্রথম দিকে ভূমির অনুপাতে কৃষকের সংখ্যা কম থাকায় জমিদাররা কৃষকদেরকে নিজ জমিতে নিয়োজিত রাখার জন্য বিভিন্ন সুযোগসুবিধা প্রদান করতো। বৃটিশ শাসনের মধ্যবর্তীকালে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এ সময় বৃটিশরা কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে জমিদারদের মধ্যে চিরস্থায়ীভাবে ভূমি বন্দোবস্ত দিলেও এর বিপরীত বাস্তবতাই প্রতিফলিত হয়। বৃটিশ শাসনের অবসানের পর পাকিস্তানী শাসনামলের প্রথম দিকে উৎপাদন সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে ভূমি-ব্যবস্থাপনা পুনর্বিন্যাস করা হয়। পরবর্তীতে সামরিক শাসকেরা ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থে একটি বিশেষ শ্রেণিকে সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ভূমি-ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনে। এর ফলে উৎপাদনের সমস্ত হাতিয়ার জোতদার শ্রেণির করতলগত হয় এবং সমাজে শ্রেণিবৈষম্যের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন সম্পর্কের এই টানাপোড়নের মধ্যে প্রকৃত চাষীরা কৃষি উৎপাদনে ক্রমাগত অমনোযোগী হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশেও অভিন্ন বাস্তবতা লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ভূমি-সম্পর্কিত প্রণীত সকল নীতিমালায় সমাজের উচ্চশ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে। এ যাবৎকালে গৃহীত ভূমিবিন্যাস ব্যবস্থার প্রায় সকল উদ্যোগই কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে কৃষকদের গভীরভাবে সংযুক্ত করার পরিবর্তে তাদেরকে বিযুক্ত রাখার প্রয়াস পেয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না গরিব/ভূমিহীন বান্ধব কৃষিনীতি প্রচলন ও বাস্তবায়িত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জমি-জলার সাথে কৃষকের সম্পর্কের প্রত্যাশিত উন্নতি সম্ভব হবে না।

তথ্য নির্দেশিকা

ইসলাম, এম. মোফাখখারুল. (২০০৩খ). *কৃষি ইতিহাস*, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.). *বাংলাপিডিয়া* (পৃ.৩৭৯-৪০১). ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।

ইসলাম, সিরাজুল. (১৯৭৫). চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি। মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী সমাজ*. ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

ইসলাম, সিরাজুল. (২০০৩ক). কৃষক সমাজ. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.). *বাংলাপিডিয়া* (পৃ. ৩৭৭-৭৯). ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।

উমর, বদরুদ্দীন. (১৯৭৮). *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক*. কলিকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড।

উমর, বদরুদ্দীন. (২০১৬). *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ*. ঢাকা: সুবর্ণ।

ঘোষ, বিনয়. (১৯৭৫). গ্রাম্য সমাজের পরিবর্তনের গতি। মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী সমাজ*. ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. (১৩৬১). বঙ্গদেশের কৃষক। যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পাদিত). *বঙ্কিম রচনাবলী*. কলিকাতা: সাহিত্য সমাজ।

চৌধুরী, আনোয়ারউল্লাহ. (১৯৮১). প্রাক্-বৃটিশ ভারতীয় সমাজ: নিশ্চলতা ও পরিবর্তন. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*. ডিসেম্বর।

চৌধুরী, বিনয়. (তারিখ নেই). *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া*।

বারকাত, আবুল ও রায়, প্রশান্ত কে. (২০০৬). *বাংলাদেশের ভূমি-মামলার রাজনৈতিক অর্থনীতি: বিশাল এক জাতীয় অপচয়ের কথকতা*. ঢাকা: নিজেরা করি, পাঠক সমাবেশ ও HDRC.

বারকাত, আবুল. (২০১৬). *বাংলাদেশে কৃষি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*। অধ্যাপক ড. মুশার্‌রফ হোসেন স্মারক বক্তৃতা। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যৌথ আয়োজিত আঞ্চলিক সেমিনার. রাজশাহী. ১৬ই জুলাই ২০১৬।

ব্র্যাক. (১৯৯০). *দেশকাল সমাজ*. উন্নয়ন গ্রন্থ সিরিজ ০২. ঢাকা: ব্র্যাক।

মজুমদার, শ্রী রমেশচন্দ্র (সম্পাদিত). (১৯৯৮). *বাংলাদেশের ইতিহাস [মধ্যযুগ]*. কলিকাতা: কালার গ্রাফিক্স।

মামুন, মুনতাসির. (১৯৭৫). চিরস্থায়ী বন্দোবস্তোত্তর পূর্ববঙ্গের সমাজ কাঠামো ও শ্রেণীবিন্যাস, মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী সমাজ*. ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

মিশ্র, চিত্তরঞ্জন ও আখতার, শিরীন. (২০১৫). প্রশাসন. *বাংলাপিডিয়া*. Retrieved from http://bn.banglapedia.org/index.php?title=প্রশাসন

রায়, সুপ্রকাশ. (১৯৭৫). ভূমি-রাজস্বের "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" (১৭৯৩): নতুন জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি। মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী সমাজ*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

রায়, নীহাররঞ্জন. (১৪০২). *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদিপর্ব*. কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

রায়, অজয়. (১৯৮৩). *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা সংকট ও সমাধান*. ঢাকা: বাংলাদেশ বুকস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড।

সুর, অতুল. (১৯৯১). কলকাতার বাবু কালচার, অতুল সুর (সম্পাদিত) *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*. কলিকাতা: নিউ ঘোষ প্রেস।

হক, এম আজিজুল. (১৯৯২). *বাংলার কৃষক*. ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

হবিব, ইরফান. (১৯৮৫). *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা (১৫৫৬-১৭০৭)*. কলিকাতা: কে.পি. বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী।

Azad, Lenin. (1990). Agrarian structure of Bangladesh: conceptual issues and change. In Saa'uddinand Islam (eds.) *Sociology and development: Bangladesh perspectives* (pp.153-192). Dhaka: Bangladesh Sociological Association.

Bhaumik, Sarkar Kumar. (1993). *Tenancy relations and agrarian development: a study of West Bengal*. New Delhi: Sage Publications.

CARE. (2003). *Land policy and administration in Bangladesh: a literature review*. CARE SDU Reports and Studies, CARE.

Chatterjee, Partha. (1986). The colonial state and peasant resistance in Bengal. *The past and present society*. 110, 1920-1947.

Childe, Gordon. (1942). *What happened in history*. Harmondsworth: Penguin Books.

Desai, A.R. (1966). *Social background of Indian nationalism*. Bombay: Oxford University Press.

Hashmi, taj Ul-Islam. (1994). *Peasant utopia: the communalization of class politics in East-*

Bengal, 1920-1947. Dhaka: University Press Limited.

Herrera, A. (2016). *Access to khas land in Bangladesh: discussion on the opportunities and challenges for landless people, and recommendations for development practitioners.* Essay on Development Policy.

Hussain, T. (1995). *Land rights in Bangladesh: problems of management*. Dhaka: University Press Limited.

Islam, Muhammad Ariful. (2013). *Mutation and updating of land records in Bangladesh: a study at Gazipur sadar Upazila*. Master's Thesis, Institute of Governance Studies. BRAC University, Dhaka.

Islam, S, Moula, G and Islam, M. (2015). Land rights, land disputes and land administration in Bangladesh-A Critical Study. *Beijing Law Review*. 6, 193-98.

Islam, Sirajul. (1988). *Bengal land tenure: the origin and growth of intermediate interests in the* 19th *century*. Calcutta: K.P. Bagchi & Company.

Islam. Shirazul. (2012). Impact of land tenure system on social structure in British Bengal. *Journal of the Institute of Bangladesh Studies*. XXXIV.

Karim, A.K. Nazmul. (1976). *Changing society in India, Pakistan and Bangladesh*. Dhaka: Nowroze Kitabistan.

Marx, Karl and Engels, Federick. (1968). *On colonialism*. Moscow: Foreign Languages Publishing House.

Mondal, Lipon Kumar. (2014). Social formation in Bangladesh: An essay on the political economy of state, class and capitalism, *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*. 59(2), 343-365.

Mukherjee, Ramkrishna. (1957). *The dynamics of a rural society: a study of the economic structure in Bengal Village*. Berlin: Akademieverlag

Rouf, Kazi Abdur, Ali Liaquit and Saifullah, Mohammad. (2015). Peasants socio-economic scenarios and technology use dynamics in Bangladesh. *Global Journal of Human-Social Science*. 15(1), 40-54.

Tenaw, Shimelles, Islam, K.M. Zahidul and Parviainen, Tuulikki. (2009). *Effects of land tenure and property rights on agricultural productivity in Ethiopia, Namibia and Bangladesh*. Discussion paper No: 33. Department of Economics and Management. University of Helsinki.

Wittfogel, Karl. (1957). *Oriental despotism: a comparative study of total power*. New Haven: Yale University Press.